মুসলিম ঐতিহ্যে

রুকইয়া সংস্কৃতি

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্‌স

ভাষান্তর

মাসুদ শরীফ

মুহাম্মাদ ইফাত মান্নান

অনুবাদ রিভিউ

আবদুল্লাহ আল মাহমুদ

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সূচিপত্র

৯ অধ্যায়-১

আত্মার জগৎ

মানুষের আত্মা ১০
উপসংহার ২৬
ফেরেশতা ২৬
ফেরেশতাদের নাম ৩২
উপসংহার ৪২
জিন ৪২
গুণাবলি ৫৯
উপসংহার ৭০

৭১ অধ্যায়-২

জিনের আছর

পরিভাষা ৭১
জিনে ধরার বাস্তবতা ৭২
জিনে ভর করার প্রমাণ ৭৩
জিনের আছরবিরোধী মতের খণ্ডন ৮২
ভর করার কারণ ৮৫
আংশিক আছর ৮৮
জাদু ৯২
বদ নজর ১০০
জিন তাড়ানোর কাজ ১০২
বৈধতা ১০৩
ওঝা ১০৫

শর্ত ১০৬
জিন তাড়ানোর পদ্ধতি ১০৮

১২৫ অধ্যায়-৩
আধুনিক মুসলিম ঝাড়ফুঁককারী

পদ্ধতি.....১২৬
কার্যধারা.....১২৬
প্রশ্নাবলি.....১২৭
২০ শতকের মুসলিম ঝাড়ফুঁককারীদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা .১৩৫
ভর করার আলামত ১৩৬
জিনে আছর করার কারণ.....১৩৭
ঝাড়ফুঁক করার পদ্ধতি ১৩৮
খ্রিষ্টধর্মে জিনের আছর ও ঝাড়ফুঁক:.....১৩৯
উৎপত্তি: ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং অ্যাপক্রিফা ১৪২
খ্রিষ্টান এক্সরসিস্টদের (ঝাড়ফুঁককারী) থেকে নেওয়া জরিপ.১৪৮

১৫৯ অধ্যায়-৪
আলোচনা

উপসংহার ১৬৩
পরিশিষ্ট ১৭১
গ্রন্থপঞ্জি ২২৮

অধ্যায়

১

আত্মার জগৎ

ইসলামি বিশ্বাস অনুসারে বুদ্ধিমান প্রজাতি (Intellectual being) তিন ধরনের: মানুষ, ফেরেশতা ও জিন। আরবিতে এদের বলা হয় 'যাওয়িল উকূল'।[১] মানব শরীরের বসবাস এই বাস্তব দুনিয়াতেই, তবে তাদের আত্মার বসবাস অদৃশ্য জগতে। ইসলামি মহাবিশ্ব-তত্ত্ব বলে, মানবাত্মা, ফেরেশতা আর জিনদের নিয়ে গড়ে উঠেছে আত্মার জগৎ। ইসলামি বিশ্বাস অনুসারে কারও ওপর যদি সত্যিই কোনো আছর পড়ে, তাহলে সেটা এই তিন প্রজাতির যেকোনো একজন, কয়েকজন বা সবার পক্ষ থেকে কৃত বলে ধর্তব্য হবে। মানুষের ওপর ভর করায় এদের ভূমিকা আসলেই কী হয়—তা জানার জন্য পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে অনুসন্ধান চালাব আমরা। দেখব তাদের বাস্তবতা, তাদের ধরণ-প্রকৃতি ও সামর্থ্য।

[১] ডিকশনারি অব ইসলাম, পৃ. ৪০

মানুষের আত্মা

আরবিতে মানুষের আত্মা বোঝাতে সচরাচর ব্যবহৃত হয় 'রুহ' বা 'নফস' শব্দ দুটো। আদিতে 'রুহ' শব্দটি আরবরা ব্যবহার করত নিশ্বাস বা বাতাস বোঝাতে। অন্যদিকে নিজের সত্তাকে বোঝাতে ব্যবহার করত 'নফস'। কুরআনে দুটো শব্দেরই ব্যবহার পাওয়া যায় মানুষের আত্মা বোঝাতে।[১]

কোনো কোনো হাদিস বিশারদ ও আইনবিদ এবং সুফিদের কেউ কেউ মনে করেন, রুহ আর নফস এক নয়। এই ব্যাখ্যা লালনকারী একজন আলিম হলেন মুকাতিল ইবনু সুলাইমান।[২] তিনি বলেছেন, 'মানুষের জীবন (হায়াত) আছে, প্রাণ (রুহ) আছে, আত্মা (নফস) আছে। নফস দিয়ে সে বিভিন্ন জিনিস বুঝে থাকে। ঘুমানোর সময় এটা তাকে ছেড়ে যায়, তবে শরীর থেকে পুরোপুরি না; দড়ি থেকে বের হয়ে আসা আঁশের মতো। ছেড়ে যাওয়া এই আত্মা দিয়ে স্বপ্ন দেখে সে, তবে হায়াত আর রুহ থাকে ঠিকই। ওই দুটো দিয়ে সে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, ঘুমের মধ্যে পার্শ্ব পরিবর্তন করে।'[৩]

কাজি আবু বকর বাকিল্লানি[৪] বলতেন, 'নিশ্বাস-প্রশ্বাসই নফস, আর জীবনের (হায়াত) বহিঃপ্রকাশ (আরাদ) হচ্ছে রুহ।'[৫]

নফস (আত্মা) আর রুহ (প্রাণ) শব্দ দুটো দিয়ে অনেক কিছু বোঝায় বটে, তবে বেশিরভাগ আলিমের অভিমত—মানুষের বেলায় দুটো শব্দ একই অর্থ বহন করে। আত্মা যখন শরীরের মাঝে থাকে, তাখন সেটিকে বোঝাতে নফস শব্দটাই বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অন্যদিকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মার বেলায় রুহ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় বেশি।

---

[১] শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, পৃ. ৪৩৩; এরাবিক-ইংলিশ লেক্সিকন, খণ্ড ১, পৃ. ১১৮০; ডিকশনারি অব ইসলাম, পৃ. ৫৪৬

[২] মুকাতিল ইবনু সুলাইমান ইবনু বশির আল-আযদি (মৃত্যু: ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দ) বলখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বসবাস করেছেন বাগদাদে। যেখানে তিনি অন্যতম মুফাসসির হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

[৩] আর-রুহ, পৃ. ৩২৭-৩২৮

[৪] মুহাম্মাদ ইবনু আত-তাইয়িব আল-বাকিল্লানি (৯৩৯-১০১৩), জন্ম বসরায়, বসবাস বাগদাদে। সেখানে একজন বিচারক এবং নেতৃস্থানীয় ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন।

[৫] আর-রুহ, পৃ. ২৭৪

মানব শরীর বোঝাতে একক শব্দ হিসেবে রুহ-এর ব্যবহার হয় না। আবার মানব শরীরের সাথে আত্মার যুগল উপস্থাপনেও ব্যবহার নেই শব্দটির।

নফস শব্দটি কখনো 'রক্ত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: ইসলামি আইনের একটি মূলনীতি হচ্ছে—'যে প্রাণীর ভেতরে প্রবাহিত রক্ত (নফস) নেই, সেটা কোনো পানিতে মারা গেলে সেই পানি অপবিত্র হয় না।' বদ নজর বোঝাতেও নফস শব্দটির ব্যবহার আছে। যেমন বলা হয়, অমুকের ওপর বদ নজর (নফস) পড়েছে। নফস দিয়ে নিজকেও বোঝায়। যেমন:

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ

'তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে (আনফুসাকুম) হত্যা করো না।' [কুরআন ০৪: ২৯]

রুহ শব্দটিরও আছে এমন বহুবিধ ব্যবহার। কখনো শব্দটি দিয়ে খোদ কুরআনকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন:

وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ

'এভাবেই আমার আদেশের মাধ্যমে আমি তোমার কাছে প্রত্যাদেশ করেছি এক প্রাণ (রুহ: কুরআন)।' [কুরআন ৪২: ৫২]

কখনো ফেরেশতা জিবরিলকে 'রুহ' বলা হয়েছে। যেমন:

نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ ١٩٣

'বিশ্বস্ত ফেরেশতা (রুহ)-এর সাথে এসেছে।' [কুরআন ২৬: ১৯৩]

বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ যে সাহায্য করেছেন, সেটাকেও কখনো তিনি বলেছেন 'রুহ' শব্দটি দিয়ে। যেমন:

أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٖ مِّنۡهُۖ

'আল্লাহ এদের অন্তরে খোদাই করে দিয়েছেন ঈমান। সাহায্য করেছেন তাঁর রুহ দিয়ে।' [কুরআন ৫৮: ২২]

অধ্যায়

২

জিনের আছর

পরিভাষা

জিন ভর করা সম্বন্ধে আরবিতে 'ছার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। মৃগীরোগ এবং খিঁচুনি বোঝাতেও ব্যবহার করা হয় শব্দটি। জিনে ভর করা লোককে বলা হয় 'মাছরূ'। মূল ধাতুশব্দ 'ছারাআ' থেকে এসেছে শব্দগুলো। এর অর্থ 'কোনো কিছু মাটিতে ছুড়ে ফেলা'। কর্মবাচ্যে শব্দটি 'ছুরিআ'; অর্থাৎ মৃগীরোগী, জিনে আছর করা বা পাগলামি।[১]

একই প্রসঙ্গে আরেকটি শব্দও ব্যবহার করা হয়—মাস্‌স্‌। ধাতুশব্দ 'মাস্‌সা'থেকে এসেছে শব্দটি। এর অর্থ: 'হাত দিয়ে স্পর্শ করা'।

এটা দিয়েও পাগলামি বা জিনের আছর করা বোঝায়। যেমন: 'বিহি মাস্‌স্‌' মানে 'তার মাঝে পাগলামি আছে'। জিনে আছর হওয়া ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয় 'মামসুস' শব্দটি।[২]

[১] এরাবিফক-ইংলিশ লেক্সিকন, খণ্ড ২, পৃ. ১৬৭৮

[২] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১১-২৭১২

প্রাসঙ্গিক আরেকটি পারিভাষিক শব্দ 'খাবতাহ'। এর অর্থ: স্পর্শ করা, জিনের আছর বা পাগলামি।[১]

আরবিতে পাগল লোককে বলা হয় 'মাজনুন'। জিন শব্দটি যে ধাতুশব্দ থেকে এসেছে, এই শব্দটিও। কখনো কখনো জিনে ভর করার কারণে পাগলামিপূর্ণ আচরণ করে মানুষ। 'মাজনুন' শব্দের অর্থে লেইনের অভিধানে আছে: এক বা একাধিক জিন বা শয়তান ভর করা ব্যক্তি; ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি; মানে বুদ্ধিহীন, পাগল, উন্মাদ, বোধবুদ্ধিহীন: (দেখুন, জুনুন) সাধারণভাবে আছর করা লোক, বা পাগল।[২]

জিনে ধরার বাস্তবতা

আগের অধ্যায় থেকে পরিষ্কার—সৃষ্টজগতের মাঝে একমাত্র জিনেরাই ভর করতে পারে মানুষের ওপর। অতীত-বর্তমানের বেশিরভাগ সুন্নি আলেম এ ব্যাপারে একমত। খুব অল্প কিছুসংখ্যক মুসলিম আলেম, দার্শনিক এবং কেতাবি ধর্মতাত্ত্বিক জিনে ধরার বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ একে একেবারেই অস্বীকার করেছেন। কেউ কেউ পাগলামি বা মৃগীরোগের একেবারে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

জিনে ধরার বাস্তবতা সম্বন্ধে বহু বিবৃত আছে প্রাচীন আলেমদের কাছ থেকে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের ছেলে আবদুল্লাহ তার বাবাকে একদিন বলেছিলেন, কেউ কেউ বলেন, জিন নাকি মানুষের দেহে ঢুকতে পারে না।

ইমাম আহমাদ বললেন—শোনো বাবা, ওরা মিথ্যে বলছে। তার মুখ দিয়ে কোনো জিন এ কথা বলছে।[৩]

ইবনু তাইমিয়াও একই কথা বলেছেন, কুরআন-সুন্নাহ এবং প্রাচীন আলেমদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে জিনদের অস্তিত্ব এক প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা। শীর্ষস্থানীয় সুন্নি আলেমদের ঐকমত্য অনুযায়ী মানবদেহে জিনের ঢোকাও প্রতিষ্ঠিত সত্য। অনেকেই এগুলো দেখেছেন, অনেকেরই এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। খিঁচুনিতে আক্রান্ত কারও দেহে জিন ঢুকে তাকে দিয়ে অবোধ্য কথাবার্তা বলায়। লোকটি নিজেও জানে না সে কী বলছে। উটকে মেরে ফেলার মতো মারাত্মক কোনো আঘাতও যদি তাকে

[১] পূর্বোক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৬৯৮

[২] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৪

[৩] ইদাহ আদ-দিলালাহ ফি উমুম আর-রিসালাহ, পৃ. ৬

করা হয়, সে তা অনুভব করে না। অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন, খিঁচুনিতে আক্রান্ত কেউ বা অন্য কারও শরীরে জিন প্রবেশ করার বিষয়টি বড় বড় কোনো আলেমই অস্বীকার করেন না। জিনের আছরকে যিনি অবিশ্বাস করেন, বলেন যে ঐশী বিধি (শরিয়া) একে ভুল বলে, তিনি আসলে ঐশী বিধির বিরুদ্ধেই মিথ্যা বলছেন। ঐশী বিধির মধ্যে এমন কোনো প্রমাণ নেই, যা কিনা জিনে ভর করার বিষয়টিকে অস্বীকার করে।[১]

মুতাযিলিদের অনেক শীর্ষস্থানীয় আলেমও স্বীকার করেছেন বিষয়টি। কাজি আবদুল জাব্বার হামাসানি বলেছেন, ওদেরকে আমাদের শরীরে ঢোকায় বাধা দেওয়ার মতো কিছু নেই। বাতাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো—(আমার মতে) যা আত্মা—যা আমাদের শরীরে ঢুকে ভেদ করে এবং লঘু হয়ে।[২] আবু উসমান আমর ইবনু উবাইদ বলেছেন, জিন মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে—একথা যে অবিশ্বাস করে সে হয় নাস্তিক, নয়তো সে নাস্তিকতার জন্ম দেবে। এই উক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

হামাসানি বলেছেন, জিন যে মানুষের ওপর ভর করতে পারে, এটা সালাত-সিয়াম-হজ-যাকাতের মতো সুপ্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট। এ জন্যই তিনি (আবু উসমান) ওই কথাটি বলেছিলেন। তো ওরকম মৌলিক বিষয়গুলো কেউ অস্বীকার করলে যেমন ধর্মত্যাগী বিবেচিত হয়, তেমনই কেবল নবির মাধ্যমে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, সেটা যে অস্বীকার করে, সে-ও অবিশ্বাসী।[৩]

জিনে ভর করার প্রমাণ

কুরআন থেকে

কুরআন-সুন্নাহ দু জায়গাতেই জিনে ভর করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সংক্রান্ত হরদম ব্যবহৃত একটি আয়ত হচ্ছে—

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ

[১] মাজমু আল-ফাতাওয়া, খণ্ড ২৪, পৃ. ২৭৭

[২] আহকাম আল-মারজান ফি আহকাম আল-জান্ন, পৃ. ১০৮

[৩] আহকাম আল-মারজান ফি আহকাম আল-জান্ন, পৃ. ১০৯

অধ্যায়

৩

আধুনিক মুসলিম ঝাড়ফুঁককারী

মুসলিমরা বর্তমানে কীভাবে জাদুটোনা দমন করছে, জিন তাড়াচ্ছে তার এক সার্বিক চিত্র দেখব আমরা এ অধ্যায়ে। এসব কাজ করতে গিয়ে তারা কতটুকু নবিজির সুন্নাহ পালন করছেন, বা কতটুকু দূরে সরে গেছেন তা-ও দেখব। পাশাপাশি ইসলামি ঝাড়ফুঁককারীদের সাথে খ্রিষ্টান ঝাড়ফুঁককারীদের তুলনা করব। অন্যান্য জাতি আর ধর্মের ন্যায় তাদের মাঝেও এসব রীতি প্রচলিত। ইসলাম যেহেতু খ্রিষ্টধর্মকে ভ্রান্ত বিবেচনা করে, তাদের ভ্রান্ত চর্চা কীভাবে জিন তাড়ায় বা জাদুটোনা দমন করে, তার একটা ইসলামি যৌক্তিক ব্যাখ্যা জানা তাই জরুরি।

পদ্ধতি

মুসলিম রুকইয়াকারীদের চিন্তাধারা এবং পদ্ধতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা চালিয়েছি। ইসলামি দুনিয়ার বহু প্রান্তের বহু রুকইয়াকারীর সাথে কথা বলেছি। মিশর, সৌদি আরব, বাহরাইন, পাকিস্তান, ভারত ও ত্রিনিদাদের প্রায় তিনজন করে রুকইয়াকারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছি। এদের সবাই দাবি করেছেন—তারা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রুকইয়া করেন। সুদানে মুসলিম ঝাড়ফুঁককারীরা যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন, সে-সম্বন্ধে একটি অপ্রকাশিত মাস্টার্স থিসিস (মনোবিজ্ঞান) থেকেও উপাত্ত নিয়েছি।

কার্যধারা

আগে থেকে তৈরি কিছু প্রশ্ন নিয়ে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। প্রশ্নগুলোর মধ্যে ছিল জীবনবৃত্তান্ত, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ, ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ। সাক্ষাৎকারগুলো রেকর্ড করে অনুলিপি তৈরি করে প্রয়োজনে অনুবাদ করে বইয়ের শেষে সংযুক্তিতে দেওয়া হয়েছে। সুদানি রুকইয়াকারীদের নিয়ে তৈরি করা মাস্টার্স থিসিস থেকে নেওয়া তথ্যও রাখা আছে ওখানে। সাক্ষাৎকারগুলো থেকে পাওয়া তথ্যগুলো ছকে সাজানো হয়েছে সহজে বিশ্লেষণ করার জন্য। তৈরি করা হয়েছে আধুনিক মুসলিম ঝাড়ফুঁককারীদের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য। ফলাফলগুলো নিয়ে আলোচনা করে তুলনা করা হয়েছে প্রাচীন সময়ের মুসলিমদের চর্চার সঙ্গে।

সবশেষে রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্মের ঝাড়ফুঁক করার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তাত্ত্বিক ভিত্তিকে তুলনা করা হয়েছে আধুনিক খ্রিষ্টীয় চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণের সাথে। এরপর সেগুলো আলোচনা করা হয়েছে ইসলামি বিশ্বাস ও চর্চার আলোকে।

প্রশ্নাবলি

নাম:

জন্মতারিখ:

জন্মস্থান:

জাতীয়তা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

১. কখন এবং কেন আপনি ঝাড়ফুঁক চর্চা শুরু করেছেন?

২. যেসব ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন তার কতগুলোতে সত্যি সত্যিই জিনে আছর করেছিল?

৩. সত্যিকারে ভর করলে কী কী আলামত দেখা যায়?

৪. আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বলুন তো, জিনে ভর করার মূল কারণগুলো কী কী।

৫. যেসব ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন, তার কতগুলোতে নারীরা জিনের আছরের শিকার হয়েছেন?

৬. পুরুষ ও নারী জিনেরা কি বাছবিচার বা কোনো পছন্দ ছাড়াই পুরুষ ও নারী মানবদের ওপর ভর করে? যদি করে, তাহলে এর শতকরা ভাগ কত হবে?

৭. শুধু কি অবিশ্বাসী জিনেরাই ভর করে? যদি না হয়, তাহলে শতকরা কত ভাগ?

৮. কখনো কি এমন হয়েছে, একটার বেশি জিন কারও ওপর ভর করেছে?

৯. জিনের আছর কি দ্রুত হয়, না সময় ধরে (মাস বছর লাগায়)?

১০. জিনেরা কি আক্রান্ত ব্যক্তির গলায় কথা বলে, না নিজের গলায়?

১১. আছর করা ব্যক্তির ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় জিনদের কথা বলতে শুনেছেন?

১২. মানব শরীরের কোন অংশ দিয়ে জিন ঢুকে এবং বের হয়? আর শরীরের কোথায় সে থাকে?

১৩. ভর করা জিনদের কি কোনো নাম বা খেতাব থাকে?

১৪. ঝাড়ফুঁক করার সময় আছরকারী জিন কি কখনো আপনার ওপর ভর করার